গল্প

‘এ রোটেটিং ফ্যান গেদারস্ মস্’

ড. শামস্ রহমান

বাঙালীর জন্য একটি পাঞ্জাবী কেনা - তার জন্য এত খোঁজা! এ দোকান, সে দোকান - সবই যেন সমান। এক সময় ব্যতিক্রমধর্মী হলেও আজ তত নয়। অন্যদের মতন বারং, কুমুদিদির এখন একই ঢং (ডিজাইন)। দোকান দুটিতে সারি-সারি ঝোলে শত শত পাঞ্জাবী। কিন্তু রং-ঢং আর মাপে সুশির মত নির্ভূল। ব্যবসায়ীরা এখন ম্যস প্রডাকশনে ব্যস্ত, তাই কাস্টোমাইজেশনের কারিগরিত্ব এখন সিকেয় ঝোলে।

অনিকের একটি অন্য রকমের পাঞ্জাবী চাই। যা কিনা রং-ঢং’এ হবে স্বতন্ত্র্য ও মার্জিত; আবহাওয়া-আদ্রতায় লাগসই, আর আলো-আধাঁরে সমান মানানসই। কোথায় পায় সে? গ্রীষ্মে ভর দুপুরে খুঁজে খুঁজে ঘেমে শেষ। রাস্তায় চল্লিশ আর দোকানে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণে উনিশ ডিগ্রি। ঘন-ঘন ‘চল্লিশ-উনিশ’ আর ‘উনিশ-চল্লিশ’এ পুড়ে-আর-শীতলে, শীতলে-আর-পুড়ে, অনিক ইস্পাতে রূপান্তরিত না হয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। ‘না, যেমনটা চাই, ঠিক তেমনটা বারং-কুমুদিদিতে মেলা ভার’। অনিক ভাবে - ‘অনেকতো হলো আনাগোনা’।

ইতিমধ্যে ঘন ঘন আসা যাওয়ায় দোকানের কর্মচারীরাও চিনে ফেলেছে অনিককে, আর জেনে গেছে তার রুচি। তাই দেখলেই বলে - ‘ভাই, নতুন ঋতুতে নতুন পাঞ্জাবী এসেছে ঠিকই, কিন্তু আপনি যা চান তা আসেনি’। ‘সাধারণ, স্বতন্ত্র্য ও সুন্দর একটি পাঞ্জাবী চাওয়াটি কি অনেক বেশী কিছু? অন্য কোন দোকানে পাওয়া যাবে কি? যেমন, বনণ্যের ‘কালো-সাদায়’, কিংবা হাতি রোডের ‘বিড়াল চোখে’। অথবা, ধোকাশানের ‘চন্দনে’? এসব ভাবতে ভাবতে অনিক আনমনা মনে বারং থেকে বেড়িয়েই - ‘এই রিক্সা’ - হাক ছেড়ে চেপে বসে এক রিক্সায়। খানিক চলার পর বায়ে মোড় নিয়ে চলতে থাকে এক প্রসস্থ রাস্তা ধরে। পুর্বে-পশ্চিমে সড়ক, লম্বায় দু কিলোমিটারতো হবেই। সড়কের দুপাশে সারি সারি গাছ। ষাটের দশকে লাগানো গাছগুলো এখনো দাঁড়িয়ে। সেনাপতির এক হুকুমে সত্তুর দশকের শেষের দিকে অত্র এলাকার সব গাছ কেটে সাফ। আজও খাঁ খাঁ করে রৌদ্দুরে। কিভাবে যে সেদিন সেই সেনাপতির নেক নজর থেকে এ সড়কের গাছগুলো বেঁচে গেল, সেটাই বিস্ময়।

দীঘল ও প্রশস্ত এই সড়কের নামের সাথে জড়িয়ে আছে এ সমাজের দীর্ঘ দিনের এক রক্তাক্ত ইতিহাস। ঊনশত্তুরের গন অভ্যুত্থানের এক বিল্পবীর নামে নাম হয় এ সড়কের - যাকে রাহমান অমর করে রেখেছে তার কালজয়ী এক কবিতা ‘... সার্ট’এ। পূর্বে-পশ্চিমে লম্বা এ সড়কের পূর্ব প্রান্তে আতঙ্কিত অথচ অকুতো ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে গন মানুষের রায়ের প্রতিক, লুই’এর অনবদ্য সৃষ্টি। আর পশ্চিম প্রান্তে সপ্ত গোম্বুজে দন্ডায়মান উপাসনালয়। ইতিহাসের এ দুই মাইলফলকের মাঝে গড়ে উঠেছে পশ্চিমা ধাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রীন H এবং সেইন্ট J। মনসংক্রান্ত এ সব অবকাঠামোগত উপাদানের সহ-অবস্থান ও সমন্বয়ে সৃষ্ট এ সড়কটিই যেন আজগের সমাজের প্রতিচ্ছবি। অনিক ভাবে - ‘জিগ্-স পাজেলের মত এটা কি নিঁখুত নৈপুণ্যে সৃষ্ট ভারসাম্য, সামনে চলার অভিনব এক কৌশল? নাকি the "Dead Sea' of contradictions, যা থেকে বেরিয়ে আসা দূরহ ব্যাপার’?

‘সার, আইসা গ্যাছি’। রিক্সাওয়ালার কথায় অনিক অনেক দূরের ভাবনা থেকে ফিরে আসে নিজের মাঝে। তখনো সে দর দর করে ঘামছে। ভাড়া মিটিয়ে সিড়ি তর তর করে বেয়ে উঠে আসে তার চার তলার চিলে কোঠায়। একটি ঘর, বাকি সবটুকু ছাদ। ছাদ থেকে নীচে-উপরে দেখা যায় অনেক দূর। গন মানুষের ঢল, কেনা-বেচার চলাচল। শোনা যায়- ‘আছে-আর-নাই যার’, দুদলেই আর্তনাদ; যানবাহনের শব্দ, গভীর রাতের নিস্তব্ধ, ঝিকিমিকি তারকারাশি। ঘরের এক কোণায় পাতা ‘রাণী’ আর ‘দ্বিগুনের’ মাঝামাঝি মাপের এক চৌকি। তাতে কাঁথা আর বালিশে স্তুপ। দীর্ঘ দিন খার জুটেনি এদের ভাগ্যে। তাই দিনে দিনে বালিসের ওসার গুলো গায়ের ঘাম আর মাথার জেলের আস্তরে আজ অনেকটাই অসার। চৌকির ঠিক উপরে একটি সিলিং ফ্যান। ঘন বসতি দালানের দেয়াল ঘেঁষে দখিনা বাতাস কিছুটা প্রবেশ করে বটে, তবে এই ফ্যানই চিলে কোঠায় গরম থেকে নিস্তারের প্রধান অবলম্বন। দেয়ালে আটা অনিকের নিজ হাতে আঁকা বিমূর্ত চে - চলার পথে চিরকালের সঙ্গি। আজও আছে। তবে আজ তা ঠান্ডা-যুদ্ধের সুনামির ঢলে বিমূর্ত থেকে বিমূর্ত্তর হয়ে উঠেছে।

ঘরে ঢুকেই অনিক সটান শুয়ে পড়ে চৌকিতে। শ্রান্তিতে চোখ বুজে আসে তার। কিন্তু বাইরের তাপ আর একটা সুন্দর পাঞ্জাবী না-পাওয়ার উত্তেজনায় ঘুম আর আসে না। তবুও শুয়ে থাকে চোখ বুজে। এক সময় যখন চোখ খুলে, দেখে মাথার উপর ফ্যান। আজ কেন যেন ফ্যানটা অনেক বড়, ছড়ানো ও ভারী মনে হচ্ছে অনিকের কাছে। ‘কি আশ্চর্য ! ফ্যানটা চালাইনি?’ - অনিক বলে। তারপর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ফ্যানের দিকে। তা অনেকক্ষন। দুরবিন দিয়ে দেখার মত দেখে - ফ্যানের পাখা, পাখাগুলোর সংযোজিত স্থল, এবং কেন্দ্রবিন্দু। ফ্যানটাকে এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে কি পূর্বে কখনো? অনিকের মনে পরে না। ‘ফ্যানটার একি হাল! রাজ্যের ধুলা-ময়লায় একাকার। সাদা পাখাগুলো কেমন যেন কালচে হয়ে গেছে। জং ধরেছে বুঝি? সারাক্ষনই তো ঘুরছে। যতক্ষন আমি ঘরে, ততক্ষনই ও ঘোরে। তারপরও? এমনতো হবার কথা ছিল না! অনিক ভাবে - সব চক্রাকারে আবর্তিত ফ্যানের কি একই অবস্থা?’ তবে যে বলে - ‘এ রোলিং স্টোন গেদারস্ নো মস্’। এটাওতো ঘুরছে। দিন রাত চরকির মত ঘুরছে। তবে কেন মস্? অনিক ফ্যানটাকে ফিরে ফিরে দেখে। সব দিক থেকে দেখে। আর ভাবে - ‘এ স্টোন-এ ফ্যান। রোলিং-রোটেটিং। নো মস্-মস্। ভেবে পায় না তফাতটা কোথায়। নীল পাহাড়ের চূড়া থেকে যদি একটি পাথর খসে পরে, তা ঘোরে ঘোরে এক চূড়া থেকে উপত্যকা হয়ে অন্য চূড়ায় পরে। তারপর উপত্যকা ঘোরে পড়ে সাগরের নীল জলে। আর ফ্যান? এও ঘোরে। তবে এক কেন্দ্রতে ভর করে, একই কক্ষপথে বিরামহীন ঘোরে। ‘তফাতটা কি সেখানেই’? অনিক ভাবে - ‘কক্ষপথের বাইরে কি ভাবা যায় না? চলা যায়না কি অন্য পথে? সেখানেই কি মিলবে সাধারণ ও সুন্দর একটি পাঞ্জাবী?’।

[গল্পটি এবছর ৭ থেকে ১০ ই জানুয়ারিতে সাংহাইয়ের গুবে এলাকার এক হোটেলে বসে অলস মূহুর্তে লেখা]